লেখকের স্বাধীনতার এক জয়গাঁথা : দ্য ভিঞ্চি কোড

অনিরুদ্ধ আহমেদ

এক.

২০০৩ সালে প্রকাশিত এবং সদ্য চলচ্চিত্রয়িত ড্যান ব্রাউনের দ্য ভিঞ্চি কোড আমাদের সামনে একটি কঠিন অথচ তিক্ত বাস্তবতাকে উন্মোচিত করলো । বিশ্বাসের আচ্ছাদনে ঢাকা ধর্ম , বার বার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে , কখনও বিজ্ঞানে , কখনও সাহিত্যেও। বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জটা বাস্তবিক হলেও , প্রত্যক্ষ ছিল না । সাহিত্যের চ্যালেঞ্জটা কল্পনাপ্রসূত হলেও , অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জের সূচনা বহু শত বছর আগে থেকে, গ্যালিলিও , নিউটনের আমল ছাড়িয়ে ডারউইন আইনস্টাইনের যুগেও এই চ্যালেঞ্জ বিস্তৃত হয়েছে। এমন কী এখন এই যে স্টেম সেল বা মূল ভ্রুণ কোষ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সে নিয়ে ও নৈতিক প্রশ্ন উঠছে। বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জটা বস্তুগত , গবেষণাগারে , বাস্তব জীবনায়নের প্রায়োগিক ভাবে প্রমাণিত। কিন্তু বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ বস্তুত কোন রকম উচ্চারিত চ্যালেঞ্জ নয়। আর সে জন্যেই সম্ভব হয়েছে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের এক ধরণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। যদিও এই বিজ্ঞানকে প্রথম দিকে মেনে নিতে পারেনি খ্রীষ্টান চার্চ । তারা পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের পরিবর্তে সূর্য কেন্দ্রিক বিশ্বকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছে এবং কোপারনিকাসের তত্ত্বের বিরুদ্ধে গ্যালিলিওর তত্ত্বকে তারা মেনে নিতে পারেনি। গ্যালিলিও চার্চের ভর্ৎসনা ও শাস্তির শিকার হয়েছেন। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে গ্যালিলিও ১৬৪২ সালে মারা যান। তবে পরে যখন খ্রীষ্টিয় ধর্মবাদীরা অনুভব করেন যে বিজ্ঞানের প্রমাণিত চ্যালেঞ্জের বিপক্ষে তাঁরা দাঁড়াতে পারবেন না , তখনই তাঁদের মধ্যে এক ধরণের আপোষকামিতা আসে। বিশ্ব সৃষ্টির বিবিলিকাল তত্ত্বের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক সত্যও তাঁরা মেনে নেন। বিজ্ঞান ও ধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়েও শান্তির্পর্ণ সহাবস্থানের দিকে এগিয়ে যায়। এই সহাবস্থানকেই ভিক্টেরীয় যুগের দর্শনে বলা হয়েছে , " ভিক্টোরিয়ান কম্প্রোমাইজ" । সেখানে ধর্মই মেনে নিয়েছে বিজ্ঞানের আধিপত্যকে , বলেছে বিজ্ঞানের এই জয়জকারের কথা ধর্মগ্রন্থে ও লেখা আছে প্রতীকি ভাবে। তাই ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে মানুষের চাঁদে যাওয়ার ঘটনাকেও মেনে নিতে যে সব ধর্মপ্রাণ মানুষ দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন প্রথমে , তাঁরাও শেষ পর্যন্ত এক রকম অলিখিত আপোষরফায় এসছেন বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে মেনে নিয়েই কিন্তু সঙ্গে এটুকু অনুসর্গ যুক্ত করেছেন যে মানবজাতি যে এমন অগ্রগতি সাধন করতে পারবে সে কথা স্বয়ং স্রষ্টাই বলেছেন তাঁর গ্রন্থে । এই ধর্মানুরাগী লোকজনের শক্তির জায়গা দু'টি , প্রথমত তাঁদের বিশ্বাস , দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানীদের তরফ থেকেও এই অকপট স্বীকারোক্তি যে তাঁরা এখন ও সব কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি , অনেক কিছুই অনাবিস্কৃতই রয়ে গেছে। তৃতীয় আরেকটি বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন বিভক্ত নিজেদের মধ্যে সেটি হলো এই বিশ্বব্রম্মান্ডটি কি পুর্ব পরিকল্পিত , এর কি কোন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনার আছেন , না কি এ কেবল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল ? যাঁরা বিশ্বাস করেন যে এটি একটি পরিকল্পিত সৃষ্টি তাঁরা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মতোই গেয়ে ওঠেন , " যিনি সকল কাজের কাজী , মোরা তাঁরই কাজের সঙ্গী ; যাঁর নানান রঙ্গের রঙ্গ , মোরা তাঁরই রসে রঙ্গি।" কিন্তু অন্যরা মনে করেন যে বিশ্ব কোন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নয় , অনেকটাই স্বতঃস্ফুর্ত ভাবেই রাসায়নিক ও আনবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট। এই দুই মতবাদের পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি রয়েছে প্রচুর কিন্তু এর কোনটাই খুব বেশী ধর্মের অনুকুলে কিংবা প্রতিকুলে নয় , সে জন্যেই আজকাল বিজ্ঞানীরা ধর্ম বিদ্বেষী কিংবা ধর্মত্যাগী হিসেবে চিহ্নিত হন না সহজেই এবং তাঁরা ঐ বিষয় সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য ও করেন না। আবার এমন বিজ্ঞানী ও আছেন যাঁরা

প্রকৃতির মধ্যে এই রহস্য আবিষ্কার করে মুগ্ধ হন স্রষ্টার কর্মকান্ডে , সেই ইন্টেলিজ্যান্ট ডিজাইনারের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস হয় প্রগাঢ় । সে জন্যেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘাতটা খুব সুক্ষ এবং গোড়াতে যারা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে শয়তানের কাজ বলে চিহ্নিত করেছিল , তারা ক্রমশই বিজ্ঞানের অবদানকে মেনে নিয়েছে , বিজ্ঞানের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি মধ্য পথ বেছে নিয়েছেন ধর্মানুসারীরা। তাঁদের কেউ কেউ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার কথা যে ধর্ম গ্রন্থে রয়েছে তার ও এক ধরণের যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিয়েছে কারণ ধর্মান্ধ ব্যক্তিও ক্রমশই বুঝেছে যে নিজের বিশ্বাসকে অটুট রেখেও বিজ্ঞানের আবিষ্কার দ্বারা উপকারের পথ বন্ধ করলে চলবে না।

দুই

তবে এখন এই একুশ শতকে ধর্মীয় তত্ব , তথ্য এক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জে ঠিক বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ নয় । যারা ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পড়ছেন , কিংবা ধর্মীয় কোন বিশেষ বিশ্বাসের কথা শুনছেন , তাঁরা গোটা বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার বিষয় করে তুলেছেন । এই বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা এবং গবেষণা গোড়াতে কোন ধর্মের কাছেই কাঙ্খিত বিষয় ছিল না। ধর্ম নিজেকেই ধারণ করে রাখে এবং ধর্ম একটি স্ব নিয়ন্ত্রিত বিষয়। ধর্ম বুঝতে হলে , অগাধ বিশ্বাসের দরকার। বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তি বিশ্লেষণের কোন রকম সমীকরণ স্থাপন করা সম্ভব নয়। ধর্ম নিয়ে কিছু বিশ্লেষনাত্মক আলোচনা হয়েছে অতীতেও কিন্তু এগুলো হয়েছে ধর্মানুরাগীদের বৃত্তের মধ্যেই। নির্মোহ স্থানে থেকে বিশ্লেষন হয়নি তেমন একটা। তাই লক্ষ্য করা যায় যে আগেকার যুগের ধর্মভীরু লোকজন বিশ্বাসের বাইরে আর কিছু বুঝতে চাইতেন না এবং বিজ্ঞানের কোন বড় চ্যালেঞ্জও তাঁদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। কিন্তু এখন ধর্মবাদীরা নিজেরাই বলতে চান যে তাঁদের ধর্ম অত্যন্ত যুক্তিসম্মত এবং বিজ্ঞান সম্মত ও বটে। এই অবস্থান ধর্মের মর্মমূলে আঘাত হেনেছে কারণ ধর্মীয় বিশ্বাসের সব চেয়ে স্পর্শকাতর জায়গাটিকে উন্মোচন করেছেন , ধর্মানুরাগীরা, সম্ভবত নিজেদের অজ্ঞাতেই। তাঁদের ধারণা জন্মেছে যে ধর্মকে যুক্তি সঙ্গত এবং বিজ্ঞানসম্মত বললে , এই সমসাময়িক মানুষের কাছে ধর্মের বিশ্বাসযোগ্যতা বোধ হয় বৃদ্ধি পাবে। সেই থেকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মকে উপলব্ধি করানোর একটি আত্মঘাতী চেষ্টা চালিয়েছেন , ধর্মানুরাগী লোকজন । লক্ষ্য করার বিষয় যে এখন ধর্ম পাঠ করছেন কেবল কোন বিশেষ ধর্মের অনুসারী এবং অনুরাগীরাই নন । ধর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাঠ করছেন অন্য ধর্মের অনুসারীরা কিংবা যাঁরা একেবারেই কোন ধর্মেই বিশ্বাস করেন না , তাঁরাও। ধর্ম সম্পর্কে এই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ফলেই এখন সরাসরি ধর্মের কিছু মর্ম কথা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য নিয়ে নয় কেবল , নানান প্রসঙ্গে ধর্মগ্রন্থের কথাই যে সর্বশেষ কথা সে কথা মেনে নিতে রাজী নন অনেকেই। ড্যান ব্রাউনের দ্য ভিঞ্চি কোড তেমনি এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে সনাতন খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি । জিজ্ঞাসা জন্মেছে যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে, তিনি ইশ্বরের পুত্র কী না , তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও। এই সব জিজ্ঞাসা বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাকে নষ্যাৎ করে দেয় এবং খ্রীষ্টপর্ব পেগান বা পৌত্তলিক বিশ্বের কিছু কিছু তথ্যের সঙ্গে খ্রীষ্টান বিশ্বের কিছু কিছু রীতি রেওয়াজকে একাত্ম করে দেখায়। সত্যবটে দ্য ভিঞ্চি কোড একটি উপন্যাস মাত্র , যেমন ছিল সালমান রুশদীর , " দ্য স্যাটেনিক ভার্সেস " ও এবং উপন্যাসে আমরা জানি গল্পকথা থাকে , থাকে অতি অবশ্যই কল্পকথাও। দ্য ভিঞ্চি কোডের কতখানি ফিকশান , কতখানি ফ্যাক্ট , সেটি অনুপাতের বিষয় কিন্তু দ্য ভিঞ্চি কোড জাতীয় লেখা অন্তত এ কথা প্রমাণ করেছে যে বিশ্বাস এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বিজ্ঞানের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও। এ কথা এ যুগে বলা খুব বাহুল্য হবে

না , যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা যত বৃদ্ধি পাবে , ততই তার বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও বাড়বে , তার নিজের তরফ থেকে না হলেও অন্যের তরফ থেকেতো নিশ্চয়ই।

তিন

ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি যে কোন ধরণের আঘাত নিন্দনীয় কিন্তু আমরা এখন যে বিশ্বে বাস করছি সেখানে রাজনীতিতে ধর্মের অনাকাঙ্খিত প্রবেশের কারণে এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অমূলক কিছু নয়। একে ঠিক আঘাত না বলে , বিশ্লেষণ ও বলা যেতে পারে। সেটা যে সব সময়ে প্রতিপক্ষের বিষয় হবে তাই নয় , বিশ্লেষকরা নির্মোহ দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করতেই পারেন । অথচ বিশ্বাসের বিষয়ে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার যেহেতু কোন অবকাশ থাকে না , সে হেতু সে ধরণের আলোচনাকে ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করার একটা প্রবণতা ও লক্ষ্য করা যায় অনেকের মধ্যে । এক শ্রেণীর মুসলমানরা মুরতাদ শব্দের যে যত্রতত্র প্রয়োগ করেন এ বোধ করি সেই বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনাকে দমন করার লক্ষে। এখনকার এই একুশ শতকের তথ্যপ্রযুক্তির সম্প্রসারণের যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। আর সে জন্যে দরকার সহিষ্ণুতা। দ্য ভিঞ্চি কোডের প্রতি খ্রীষ্টান বিশ্বের সহিষ্ণুতা ছিল প্রশংসনীয় । ভ্যাটিকান দ্য ভিঞ্চি কোডের নিন্দে করেছে , নিন্দে করেছেন বেশ কিছু খ্রীষ্টান যাজক , মৃদু মন্দ প্রতিবাদ হয়েছে ভারতে এবং অন্যত্র ও কিন্তু কেউ লেখক ড্যান ব্রাউনের বিরুদ্ধে কোন রকম ফতোয়া জারী করেনি , তাঁর মৃত্যুদন্ডাদেশ জারী করেননি খ্রীষ্টান বিশ্বের কোন ধর্মীয় নেতা। এমন কী ভারতে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী সোনিয়া গান্ধীকে তুষ্ট করার যে ব্যর্থ প্রয়াস নিয়েছিলেন ভারতের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী , দ্য ভিঞ্চি কোডকে নিষিদ্ধ ঘোষণার চেষ্টা করে , সেটি ও সফল হয়নি। দ্য ভিঞ্চি কোডের এই প্রায় অবাধ প্রচার ও প্রসার বুদ্ধি মুক্তির ক্ষেত্রে এক বিরাট বিজয় বলে মনে করা যেতে পারে। সত্য বটে যে দ্য ভিঞ্চি কোডে কল্পনা আছে প্রচুর , কাহিনী কাঠামোতে দ্য ভিঞ্চি কোড বস্তুত থ্রিলার জাতীয় একটি রহস্য উপন্যাস কিন্তু এর মধ্যে যে অন্তর্গত এক চ্যালেঞ্জে রয়েছে সেটি ঐ গ্রন্থের সব চেয়ে বড়ো বিজয়। আর এই বিজয় সম্ভব হয়েছে তাদের জন্য যারা ঐ বইয়ে লেখা তথ্যের সঙ্গে সম্পুর্ণ দ্বিমত প্রকাশ করেও নীরব থেকেছেন কিংবা প্রতিবাদ করেছেন , সুশীল ভাবে।

চার

দ্য ভিঞ্চি কোড পশ্চিমের , বিশেষত খ্রীষ্টান বিশ্বের সহিষ্ণুতার একটি দৃষ্টান্ত। যে ধর্মে এক সময়ে বিজ্ঞান চর্চার জন্যে প্রাণদন্ড পর্যন্ত দেয়া হতো , সেই ধর্মানুসারীরা অপরের মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতাকে মেনে নিয়েছেন, সেটি প্রশংসনীয় । বর্তমান বিশ্বে যখন আমরা ধর্মের নামে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে উন্মুখ হয়ে থাকি , যখন আমরা জোর জবরদস্তি করে পরধর্মানুসারীদের ও বাধ্য করাতে চাই আমাদের বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখতে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি তাদের কোন ব্যঙ্গ সমালোচনায় , উত্তাল উন্মাদনায় উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করি , তখন এই দ্য ভিঞ্চি কোডই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে মিথের চেয়ে মানুষই বড়ো। গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে হলে মানুষের যে মৌলিক অধিকারগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে , সে হলো মত প্রকাশ করার অধিকার । সেই মত হয়ত অন্যের মত ও পথ থেকে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ধর্মীয় আবেগে আঘাত লাগছে , এই কথা বলে মারমুখী হবার অবকাশ এখনকার বিশ্বে কমে আসছে ক্রমশই। আর আমরাতো সেই সুশীল বিশ্বের জন্যে কাঙ্খিত যেখানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝ খানের ধুসর এলাকাগুলোও যুক্তির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । আশা করবো ড্যান

ব্রাউনের মতো আরো লেখক আসবেন , কেবল খ্রীষ্টান সমাজে নয় , অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও যাঁরা তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষ্য রাখতে বিজ্ঞানে কিংবা কলপকাহিনীতে কারও দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবেন না , নিহত , নির্বাসিত কিংবা পরিত্যাজ্য হবেন না কেবল এই কারণে যে তিনি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে পারেননি। তাঁর সেই বাহ্যত অক্ষমতা , আসলে ক্ষমতাই তো এক প্রকারের।

[সমকাল পত্রিকায় ১৮ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত]